@মাস.Com

২৮ সেপ্টেম্বর , ২০২২
পুজো সংখ্যা

সাংবাদিকতা ও গনজ্ঞাপন বিভাগ

বিবেকানন্দ কলেজ , ঠাকুরপুকুর

Editor's Column

As Abraham Lincoln once commented, the art of writing is perhaps the greatest invention. In an age where its significance is being forgotten, it is especially important to preserve and encourage it. The free expression of ideas is the bedrock of intellectual prosperity. The protection of this freedom is essential for any modern society and a value that all educational institution must kindle.

@mass.com , the departmental journal of Journalism and mass Communication Department of Vivekananda College ,Thakurpukur is a sincere attempt to fulfill that very responsibility. It offers an apt platform for students to channelize their thoughts and explore their creative identities. On the occasion of auspicious Sharad utsav we are presenting a collage of beautiful stories, articles, exquisite poetry, painting and photographs to create a memoir that is valid testament to what we stand- individuality, benevolence and the courage to express oneself.

Happy reading!

শুভেচ্ছা বার্তা

যে কোনও শুভ উদ্যোগ শুরুর পর হঠাৎই তা পথ হারালে আবার সেই পথের সন্ধান খুঁজে পাওয়া যথেষ্ট কঠিন। আমাদের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ সেই হারিয়ে যাওয়া পথের সন্ধানে ব্রতী হয়েছে। এই বিভাগের দুটি পত্রিকা শুরুর দিকে জনমানসে ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়ে ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে নানাবিধ কারণে এবং করোনার দৌরাত্ম্যে সেই শুভ উদ্যোগ পথভ্রষ্ট হয়। পুনরায় সেই হারানো পথের সন্ধানে বিভাগীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পত্রিকা প্রকাশনায় ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিভাগীয় এই প্রকাশনা হয়ে উঠতে পারে প্রতিদিনের পুঁথিগত পঠন-পাঠনের অর্জিত জ্ঞান কে ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্র।

কলেজের প্রতিটি বিভাগে নির্দিষ্ট পঠনপাঠনের পাশাপাশি একাধিক অনুষ্ঠান সংগঠিত হয় প্রায় প্রতিদিনই। সেমিনারে গুরুগম্ভীর আলোচনা ছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় যোগদানের ক্ষেত্র হিসাবে আয়োজন করা হয় একাধিক প্রতিযোগিতা, বসে খেলার আসর। আর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছুদিন উজ্জাপিত হয় ক্যালেন্ডারের তারিখ মেনে। সুতরাং কলেজের চৌহদ্দিতেই রয়েছে খবরের আকর। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এই পত্রিকা প্রকাশনা সচল রাখার দায়িত্ব মিলিতভাবে বিভাগের সঙ্গে যুক্ত সকলের। ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় যোগ দান ও অধ্যাপক- অধ্যাপিকাদের সুচিন্তিত পরামর্শে এগিয়ে চলুক এই শুভ উদ্যোগ।

অধ্যক্ষ-

ড:তপন কুমার পোদ্দার

বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর

Dept. of Journalism and Mass Communication, 28th September, 2022

MESSAGE

Mass Communication is a subject of great relevance today. Those who study it seriously, know it well. There are, of course, people who discredit journalism, without knowing its contribution to the society. Democracy remains alive through journalism and mass communication. Politicians and businessmen try to use them for their benefit – one for propaganda and the other for sales and marketing; if we don't fall a prey to them, none can question the credibility and the genuineness of the subject and its skills.

The skills of journalism need to be learnt with great patience; it is not easy as some would like to think. A college journal is a wonderful means to learn the basic skills. Everybody today prefers the mobile phone or other audio-visual gadgets to procure information or news; but the print media teaches one the basics of expression, through writing. Without this training, the foundation of mass communication skills remains shaky. There may be different styles in print writing, AV scripting or web content creation but all these skills germinate from communication principles taught through journal writing.

All the best for those who will create "@mass.com"

Buroshiva Dasgupta

(a masscom teacher & practitioner)

Director,
School of Mass Communication, Fine Arts & Design
Sister Nivedita University

শুভেচ্ছা বার্তা

আপনাদের এই নতুন উদ্যোগ, এই নতুন পত্রিকার জন্য রইল অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন । পত্রিকাটির নাম করণে অভিনবত্ব ও আধুনিকতা আছে। মাস কমিউনিকেশন বিভাগের প্রাসঙ্গিকতা এই মুহূর্তে শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, এমনকি শুধু ভারতে নয়, গোটা বিশ্বে অনিবার্য। এই পোস্ট ট্রুথ যুগে মাস কমিউনিকেশনে এসেছে অনেক নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ। যা কিছু হচ্ছে সবই খারাপ আমি এমন মতের সাথে ভিন্নতা রাখি, আবার গোটা পৃথিবী জুড়ে এমনকি ভারতের সাংবাদিকতা এখন এক মহান স্বর্ণযুগ অতিবাহিত করছে এমনটা কখনো নয়। এই নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে আজকের প্রজন্ম আরো উন্নত, আরো বিকশিত, আরো সম্ভবনাময় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে এই আশা রাখি।

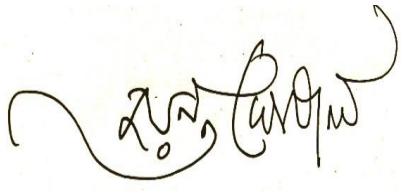

কনসাল্টিংএডিটর ইন্ডিয়া টুডে গ্রুপ

শুভেচ্ছা

একথা বলা ঠিক হবেনা যে, কোনো একটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থা অথবা সম্পর্কিত ইস্যুগুলির সবকটি-ই ত্রুটিপূর্ণ। বর্তমান সময়ের নিরিখে একদিকে অপার্থিব দুনিয়ার ভুলভুলাইয়া আর অন্যদিকে ব্যক্তি, জাতি এবং সংস্কৃতির পরিচয় সংকট- একটি প্রাসঙ্গিক ইস্যু। বিপদের এই সঙ্গমে ত্রিধারার মত এসেছে মিডিয়া'র বাড়বাড়ন্ত। আর একটু স্পষ্ট করে বললে সামাজিক মাধ্যম, সঙ্গে তার দোসর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম। সত্যি কথা বলতে কী যে কোন বিষয়ে যখন অনেক মানুষ, সংস্থা বা চিন্তা একসঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, সেখান থেকে শুরু হতে পারে মধ্যমেধার একটি ঋনাত্বক ন্যারাটিভ। সাম্প্রতিক অতীতে সংবাদ- সাংবাদিক- সাবাদিকতার প্রভূত উন্নতি ঘটেছে, সেকথা স্বীকার করতে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু 'মাস কমিউনিকেশান' সে ভাবে দাগ কাটতে পেরেছে কি? আসলে সাংবাদিকতা, মাস কমিউনিকেশানের একটি ছোটো শাখা মাত্র। কোনো একটি বিষয়ে টিকে থাকা এবং তার ইতিবাচক, গুনগত বৃদ্ধি নির্ভর করে, বিষয় সম্পর্কে কত গভীর আলাপ বা প্রকরণ সংঘটিত হচ্ছে তার উপর। অর্থাৎ একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং আন্তঃবিভাগীয় গবেষণা বিষয়টিকে সজীব রাখতে সাহায্য করে। এই ধরণের উদ্যোগে কোথাও যেন একটু ঘাটতি থেকে গিয়েছে বলে মনে হয়। 'মাস কমিউনিকেশান'- যেন এখন বড্ডো বেশি সাধারন পাঠ্যক্রম; একঘেয়ে শিক্ষাক্রম অথবা কিছু আলঙ্কারিক ধামাকা নিয়ে ব্যস্ত থাকছে। আমার আশা রইল; আমি বিশ্বাস করতে চাইব যে আপনাদের এই পত্রিকা বয়ে চলা 'ন্যারেটিভ' থেকে বেড়িয়ে এসে গবেষণামূলক নতুন চিন্তা তুলে আনবে তার প্রতিটি পাতায়। আমি বিশ্বাস করতে চাই যে, শুরু হতে চলা এই পত্রিকার কোন একটি পৃষ্ঠা অথবা কিছু শব্দবন্ধ আগামী দিনে উন্নয়নমূলক জ্ঞাপন, জনস্বাস্থ্য, জনমত ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতুন কোন দিশা দেখাতে পারবে। এই শুভ চিন্তা আশীর্বাদ হয়ে জড়িয়ে থাকুক ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজের সাংবাদিকতা এবং গণজ্ঞাপন বিভাগ থেকে প্রকাশিত পত্রিকার প্রতিটা পর্যায়ে।

রাজেশ দাস
সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপণ বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

Navapatrikā: Vegetal Symbols of Magna Mater

Kuntal Narayan Chaudhuri
Assistant Professor, Department of Botany, Vivekananda College, Kolkata
knchaudhuri@gmail.com

The cult of Magna Mater or the 'Great Mother' is *probably the oldest religion and venerates* the Earth as the metaphorical source of Life*. The Indic Magna Mater,* Śakti *or the 'Energy', is manifested in myriad forms of the primordial feminine in classical pantheons as Devī or the 'Goddess', but as Yakśī or the 'Nymph' of folklore bears deeper roots stretching into the unfathomable depths of prehistory.*

In Bengal, and others parts of eastern India, the harbinger of autumn are the endless white arrays of wild sugarcane—*Saccharum spontaneum* L. (Poaceae)—in full bloom, called *kāśphul* in Bengali, fluttering and dancing in the breeze under clear blue skies. The autumnal festival of Durgāpujā, synchronized with the ebb and flow of traditional agricultural almanacs, is a poignant return of the goddess along with her children (and their animal mounts), from her celestial snowy abode on Mt. Kailāśa to her earthly kith and kin living next to the golden rice paddies of the Gangetic delta. Along with her clay idols, impeccably draped and decorated with the milk white solapith—*Aeschynomene aspera L.* (Fabaceae)—craft called *śolārsāj* in Bengali, nine vegetal symbols of Śakti that tenderly assumes the mystical form of an ensemble of nine types of sacred leaves called the Nabapatrikā, are also propitiated. These nine sorts of leaves are from nine different plants, each symbolizing its tutelary deity who embodies its life sap. These are called in Bengali: (1) *kalā* or banana i.e. *Musa* × *paradisiaca* L. (Musaceae), (2) *kacu* or taro i.e. *Colocasia esculenta* (L.) Schott (Araceae), (3) *halud* or turmeric i.e. *Curcuma longa* L. (Zingiberaceae), (4) *Jayantī* or river hemp i.e. *Sesbania sesban* (L.) Merrill (Fabaceae), (5) *bēl or* woodapple i.e. *Aegle marmelos* (L.) Corrêa (Rutaceae), (6) *dālim* or pomegranate i.e. *Punica granatum* L. (Lythraceae), (7) *aśok* or ashoka i.e. *Saraca asoca* (Roxb.) Willd. (Fabaceae), (8) *mānkacu* or giant taro i.e. *Alocasia macrorrhizos* G.Don (Araceae), and (9) *dhān* or paddy i.e. *Oryza sativa* L. (Poaceae).

Popularly called Kalābou i.e. literally the 'Banana Consort' in Bengali, in the wee hours of Mahās*aptamī the banana tree and other plants are ritually bathed in a river and ceremoniously placed next to the idol of Gaṇeśa (the 'Lord of Hosts') for the ritualized worship of* Durgā (the 'Invincible One')*.* The constituent crop species of the Nabapatrikā have immense ethnobotanical significance as staple food, spices and medicine. Their invisible divinities viz. Brahmāṇī, Kālikā, Umā, Kārtikī, Śibā, Raktadantikā, Śōkarahitā, Cāmuṇḍā and Lakṣmī respectively, embody myriad facets of the life-nourishing forces of Nature. Thus, as the Divine Mother, the Purānic guardian deity is now inseparable from these relics of vegetal or arborescent nature spirits of the agrarian communities of yore.

মাতৃপক্ষ

অর্ণব

চিন্ময় আর তমালীর সাড়ে পাঁচ বছর হল বিয়ে হয়েছে। ওদের কোনো সন্তান নেই। ওদের বাড়িতে ৫৬ বছর ধরে দুর্গা পুজো হয়ে আসছে।মহালয়ার দিন একটা বাজে খবর আসে। চিন্ময় গঙ্গায় তর্পণ করতে গিয়ে দেখতে পায় একটি দু বছরের বাচ্চা মেয়ে তার মায়ের মৃতদেহ কে আগলে ধরে কেঁদে যাচ্ছে। চিন্ময় কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে মেয়েটাকে বাড়ি নিয়ে আসে। বাড়িতে এসে অশান্তির শেষ থাকে না। একেতেই পুজো বাড়ি নানা কাজ তার ওপর এই ঝামেলা।তমালীর শাশুড়ি সাফ জানিয়ে দেয় যে এই মেয়েকে উনি ওনার নাতনি বলে মেনে নিতে পারবেন না।

তমালীর পিসিশাশুড়ি বলেন, " হ্যা রে তমা, এর মা তো জলে ঝাঁপ দিয়ে মরেছে। নিশ্চয়ই কিছু কেলেঙ্কারি আছে। এই মেয়ে কে নিয়ে ঝামেলায় জড়াস নে তো। ওকে হোম এ রেখে দিয়ে আয়। দেখ এতকাল তো ধৈর্য্য ধরলি..আরেকটু ধর। এই বংশের ওয়ারিস ঠিক আসবে। "চিন্ময়ের পিসি এই বংশের প্রথম গ্র্যাজুয়েট। তার মুখে এই সব কথা শুনে তমালি দৃঢ় প্রতিবাদ করে বলল, - "এক কাজ করুন পিসিমা, এই বাড়ির দুর্গা পুজো বন্ধ করে দিন! কি হবে করে? ওই মাটির মূর্তির সাথে আপনাদের কি কোনো রক্তের সম্পর্ক আছে নাকি মা দুর্গা আপনাদের বংশের ওয়ারিস? উনি তো আমাদের কাউকে জন্ম দেন নি তাও আমাদের কাছে উনিই সবচেয়ে বড় ভরসা। রক্তের সম্পর্কের বাটখারায় সব মাপা যায়না। পিসিমা! আপনার নিজের রক্ত আপনার ছেলে কেন আপনাকে দেখে না? শুনুন ভালো করে সকলে, যদি আমার মেয়ে উমা এই বাড়িতে না থাকতে পারে তাহলে কোনো পুজোও হবে না এ বাড়িতে। এবার দেখি কার হিম্মত আছে আমার মেয়ে কে আমার কাছ থেকে দূরে সরায়! "

আজ মহালয়া। আজ উমার জন্মদিন। আজ দেবীপক্ষের সাথে মাতৃপক্ষেরও সূচনা।

বনেদী অন্দরে উমার আরাধনা

অয়ন মুখার্জী

" আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গলগাও ,
জননী এসেছে দ্বারে
সপ্তসিন্ধু কল্লোলরোল
বেজেছে সপ্ততারে "

বাঙালির মনে - প্রাণে এবং আবেগে দুর্গাপুজোর গুরুত্ব ঠিক কতখানি তা যেনো মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়ে দেয় গীতিকার হীরেন বসু - র লেখা উপরোক্ত লাইনগুলি | দুর্গাপুজো মানে বাঙালির কাছে কেবল ' দেবীরূপে ' দুর্গার পুজো নয় | দুর্গাপুজো মানে কেবল চণ্ডী পূরাণ ,কালিকা পূরাণ কিংবা বৈদিক রীতিরেওয়াজ মেনে পালিত হওয়া কোনো আধ্যাত্মিক কচকচানি নয় | দুর্গাপুজো মানে হলো বাঙালির সামগ্রিক সংস্কৃতি , ঐতিহ্য , অতীত কিংবা বর্তমান | এই পুজোর ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যায় একাধিক রাজপরিবার ও বনেদী বাড়ির কথা | প্রতিটি রাজ পরিবারের পুজোর মধ্যেই যেন উজাড় করে আছে জৌলুস , ঐতিহ্য আর পুজোর বিশেষ রীতিনীতি | সেসব গরিমা দেখলে আমাদের অবাক হতেই হয় |

বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা রাজ পরিবারের পুজো -

বাংলার রাজ পরিবারগুলিতে পুজো শুরুর যথার্থ নথি না পাওয়া গেলেও, প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে দেবী দুর্গার পরিচয় আছে। অনেকেরই মতে, সম্ভবত মোঘল আমল থেকেই ধনী পরিবারগুলিতে দুর্গা পুজো করা হত। ইতিহাস বলছে দেবীর পুজো সম্ভবত ১৫০০ শতকের শেষ দিকে প্রথম শুরু হয়। সম্ভবত দিনাজপুর- মালদার জমিদার স্বপ্নাদেশের পর প্রথম পারিবারিক দুর্গা পুজো শুরু করেছিলেন। তবে এই দুর্গার রূপ ছিল অন্যরকম। লোককথা মতে আদি দুর্গার চোখ গোলাকার ও উজ্জ্বল এবং দেবী সাদা বাঘ ও সবুজ সিংহের উপর বিরাজ করেন। বর্তমানে প্রচলিত দেবী প্রতিমার পুজো বাংলার সমাজে তথা রাজপরিবার গুলিতে শুরু হয় তার পরবর্তী সময়ে |

ভবানন্দ মজুমদারের বাড়ির পুজো –

ইতিহাস অনুযায়ী নদিয়া রাজবংশের আদি পুরুষ ভবানন্দ মজুমদার মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গিরের দেওয়া ফরমানে রাজা হয়েছিলেন। জনশ্রুতি, তিনি অন্নপূর্ণার পুজো করতেন। পরবর্তী কালে এই পরিবারে দুর্গোৎসবের প্রচলন হয়। তাঁর পূর্বপুরুষের রাজত্ব ছিল কৃষ্ণনগর এলাকায় | তিনি ঢাকা থেকে আলাল বক্স নামে এক স্থপতিকে আনিয়ে তৈরি করান চকবাড়ি, কাছারিবাড়ি, হাতিশালা, আস্তাবল, নহবৎখানা এবং পঞ্চ অলংকৃত দুর্গাদালান। রুদ্র রায়ের উত্তরপুরুষ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহা সমারোহে এই পারিবারিক পুজো করতেন। তিনিই প্রথম সর্বসাধারণের মধ্যে দুর্গোৎসবের প্রচলন করেন যা পরবর্তী কালে সর্বজনীন পরিচিতি পায়।

প্রচলিত দুর্গা প্রতিমার চেয়ে আলাদা এই মূর্তি। দেবী দুর্গার সামনের দুটি হাত বড়, পিছনের আটটি হাত আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট। দেবীর গায়ে থাকে বর্ম, এখানে তিনি যুদ্ধের বেশে সজ্জিতা। পিছনে অর্ধগোলাকৃতি সাবেক বাংলা চালির এক দিকে আঁকা থাকে দশাবতার, অন্য দিকে দশমহাবিদ্যা। মাঝে থাকেন পঞ্চানন শিব। দেবীর বাহন পৌরাণিক সিংহ। সামনে থাকে ঝুলন্ত অভ্রধারা। এই পুজোয় দেবীর ডাকের সাজে ‘বেদেনি ডাক’ এর ব্যাবহার লক্ষ্য করা যায়।

বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের দুর্গাপুজো -

বিষ্ণুপুরের মহারাজ জগৎ মল্ল ৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে দেবী প্রতিষ্টা করেন ও দুর্গাপুজো শুরু করেন। এই পুজোয় দেবী দুর্গাকে মহাকালী , মহালক্ষ্মী ও মহা সরস্বতী এই তিন রূপে পুজো করা হয়। দেবী বোধনের পনেরোদিন আগেই পটচিত্রের দেবী ঠাকুরানের পুজোর মাধ্যমে দুর্গাপুজোর সূচনা হয়। মল্ল রাজাদের পুজোতে বর্তমানেও দেবী দুর্গাকে স্বাগত জানানো হয় কামানের তোপধ্বনির মাধ্যমে এবং বিসর্জনের সময়েও কামান দাগার প্রথা প্রচলিত আছে।

বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির পুজো-

জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে পাঁচশোপাঁচ বছরের ইতিহাস। কোচবিহার রাজপরিবারের সদস্য বিশ্ব সিংহ ও বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির সদস্য শিশ্ব সিংহ -এর উদ্যোগে এই পুজো শুরু হয়। এই পুজোয় একসময় নরবলি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই পরিবারে পুজোতে দেবী দুর্গার পাশে তাঁর সন্তান সন্ততি ছাড়াও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মা মহামায়া ও জয়া - বিজয়ার বিগ্রহ পুজিতো হতে দেখা যায়।

কাশীপুর রাজবাড়ির পুজো -

পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর রাজবাড়ির দুর্গাপুজো বাংলার অন্যতম প্রাচীন দুর্গাপুজো গুলোর মধ্যে একটি। এই পুজো প্রায় হাজার বছর পুরনো। এখানে দেবী দুর্গা সারাবছরই রাজবাড়িতে অধিষ্ঠাত্রী দেবীরুপে পূজিত হন। এই পুজোর সূচনাকে কেন্দ্রকরে সেনরাজা লক্ষণ সেন ও তৎকালীন কাশীপুর রাজবাড়ির পঞ্চকোটের সিং রাজাদের মধ্যে যুদ্ধের কাহিনী প্রচলিত আছে। এই পুজোতে দেবীর 'দশভূজা' রূপের পরিবর্তে চারহাতের দেবীমূর্তি পুজো পায়।কাশীপুরের রাজপরিবারের পুজোতে মোষ বলির প্রচলন রয়েছে।

কাঁথি রাজবাড়ির দুর্গাপুজো -

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি এলাকার সমুদ্র তীরবর্তী এই রাজবাড়িতে দুর্গাপুজো শুরু হয় ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে। রাজা যাদবরাম রায় দেবী মায়ের স্বপ্নাদেশে দুর্গাপূজার প্রচলন শুরু করেন। এই দুর্গাপুজোতে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় , মায়ের ঘট পশ্চিমদিকে রাখা থাকে। এই পুজোয় আগে ছাগল ও মোষ বলির প্রচলন ছিল , যদিও বর্তমানে এখানে আর পশুবলি হয়না।

এই দুর্গাপুজোগুলি ছাড়াও, বাংলার বিভিন্ন জেলায় গ্রাম ও মফঃস্বল গুলিতে আরও একাধিক রাজপরিবার এর দুর্গাপুজো অত্যন্ত প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। সর্বোপরি এই পুজোগুলির মধ্যে অনেক পুজোই বর্তমানেও অত্যন্ত আড়ম্বরিতার সাথে পালিত হয় , আবার কালের নিয়মে অনেক পুজোই তার অতীতের জৌলুস হারিয়েছে । তবে ,এই পুজোগুলির মধ্যে আজও বেঁচে আছে বাঙালির কৃষ্টি , বাঙালির আবেগ। বনেদী বাড়ির এই পুজোগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পুজো হলো -

হুগলির শ্রীরামপুর রাজবাড়ির দুর্গাপুজো , নিমতিতা রাজবাড়ির দুর্গাপুজো , নদীয়ার শান্তিপুর রাজবাড়ির দুর্গাপুজো ,মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপুজো , বীরভূমের হেতমপুর রাজবাড়ির দুর্গাপুজো , মালদার গাজলের জমিদার বাড়ির পুজো , বাঁকুড়ার কোষ্ঠিয়ার জমিদার বাড়ির পুজো , পূর্ব বর্ধমানের আন্দুলের জমিদার বাড়ির পুজো , নবদ্বীপের ভট্টাচার্য বাড়ির লালদুর্গা , বিপ্লবী বাঘাযতীনের স্মৃতিবিজড়িত হাওড়ার বাগনানের নন্দী বাড়ির পুজো , শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের স্মৃতিবিজড়িত বাঁকুড়ার ভদ্র পরিবারের পুজো , নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতিবিজড়িত কোদলিয়ার বসু পরিবারের পুজো , উত্তর চব্বিশ পরগনার গোবরডাঙার রাজবাড়ির পুজো, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগরের মিত্র বাড়ির পুজো , বীরভূমের সিউড়ির বসাক বাড়ির পুজো প্রভৃতি।

কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজো –

ব্রিটিশ শাসনকাল ও তার পূর্ববর্তী সময়কাল থেকেই কলকাতার বিভিন্ন বনেদি জমিদার বাড়ি ও রাজবাড়ি তে চলে আসছে দুর্গাপুজোর প্রচলন। কলকাতা শহরে বিগত তিন থেকে চার শতাব্দী দেবীর অকালবোধন এর পুজো প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজোয় থাকতো বিভিন্ন চমক, পুজোগুলি জাঁকজমকতায় ও ব্যাপকতায় ছিল জেলার বনেদি বাড়ি গুলির চেয়ে কয়েকধাপ এগিয়ে। মণ্ডপ ও রাজবাড়ির সাজসজ্জা , পশুবলি ও পুজোকে কেন্দ্রকরে চলা বিভিন্ন অনুষ্ঠান ব্রিটিশ বাংলায় সাধারণ মানুষের কাছে ছিল কার্যত অভাবনীয়।

কলকাতার বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজো নিয়ে বাংলায় এক প্রাচীন প্রবাদ দেখা যায় , সেটি হলো :

" মা এসে গয়না পরেন জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁ - র বাড়িতে,

ভোজন করেন কুমোরটুলির অভয়চরণ মিত্রের বাড়িতে ,

আর রাত জেগে নাচ দেখেন শোভাবাজার রাজবাড়িতে। "

সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের দুর্গাপুজো –

মুঘল আমলে হালিশহর থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত সমগ্র এলাকার জায়গীরদার ছিলেন সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার। উল্লেখ্য , তাঁরাই প্রথম কলকাতায় দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন। ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে সাবর্ণদের পুজো শুরু হয়। বর্তমানে সাবর্ণ পরিবারে মোট সাতটি দুর্গাপূজা হয়। এগুলির মধ্যে ছয়টি হয় বড়িশায় এবং আরেকটি হয় বিরাটিতে।

জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁ - র বাড়ির দুর্গাপুজো -

দাঁ-বাড়ির পুজো আরম্ভ হয় ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। শিবকৃষ্ণ দাঁ-এর আমলে এর জৌলুস বাড়ে বিদেশ থেকে প্রতিমার গয়না আমদানি করার জন্য । জার্মানি ও প্যারিস থেকে হীরে ও চুনি বসানো গয়না বানিয়ে আনেন শিবকৃষ্ণ। গয়নার এই আতিশয্যের জন্যই তৈরি হয় বাংলার প্রাচীন প্রবাদটির প্রথম বাক্য — “মা এসে গয়না পরেন জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁ - র বাড়িতে ।”

কুমোরটুলির অভয়চরণ মিত্রের বাড়ির দুর্গাপুজো -

অভয়চরণ মিত্র ছিলেন ব্রিটিশদের কাছে ‘ব্ল্যাক জমিনদার’ নামে খ্যাত গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র । অভয়চরণ ২৪ পরগণার কালেক্টরের দেওয়ানের পদ অর্জন করে বহু অর্থ উপার্জন করেন । তাঁদের পারিবারিক দুর্গাপূজা তাঁর আমলে আরো বেশি জৌলুস পায় । মিত্র বাড়ির দুর্গা প্রতিমাকে স্বর্ণ ও রৌপ্য পত্রে মোড়া হত । দেবীর ভোগের জন্য তিরিশ থেকে পঞ্চাশ মন চাল ব্যাবহার করা হতো এবং এক হাজার ব্রাহ্মণকে ভোজন ও উপহার দেওয়া হতো । এই বিরাট ভোজের আয়োজনের জন্যই তৈরি হয় প্রাচীন প্রবাদটির দ্বিতীয় বাক্য — “মা ভোজন করেন কুমোরটুলির অভয়চরণ মিত্রের বাড়িতে ।”

শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপুজো –

১৭৫৭ সালের অক্টোবরে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজের পরাজয়ের পর রাজবাড়ির ঠাকুর দালানে প্রথম শুরু হয় দুর্গাপুজো। এই পুজোকে 'কোম্পানির পুজো'ও বলা হত সে সময়ে, কারণ ফিরিঙ্গীরা ছিল এই বনেদী দুর্গোৎসবের অন্যতম অংশ।

কথিত আছে লর্ড ক্লাইভকে খুশি করার জন্য পুজোর আয়োজন করেন নবকৃষ্ণ রায়। এই পুজোকে কেন্দ্র করে সেকালে বিভিন্ন বিলাসবহুল অনুষ্ঠান এমনকি ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীদের জন্য মদ্যপান, বাইজি নাচের ব্যাবস্থাও থাকতো। তাই প্রাচীন প্রবাদটির তৃতীয় অংশটিতে রয়েছে : "আর রাত জেগে নাচ দেখেন শোভাবাজার রাজবাড়িতে। "

রানি রাসমনির দুর্গাপুজো -

মধ্য কলকাতার জানবাজার এই রাজবাড়ির পুজোটি হয় | ১৭৯০ সালে এই পুজো শুরু হয়। এই পুজো শুরু করেন রানি রাসমণির শ্বশুরমশাই প্রিতিরাম দাস মহাশয়। ওনার পর ওনার ছেলে রাসমণি দেবীর স্বামী বাবু রাজচন্দ্র দাস এই পুজো চালিয়ে নিয়ে যান। প্রসঙ্গত ওনার নামেই বাবুঘাটের নামকরণ। রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে ১৮৩৬ সাল থেকে রানি রাসমণি এই পুজোর দায়িত্ব নেন। ১৮৬১ সালে রানি রাসমণি দেবীর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা মথুরবাবু পুজোর দায়িত্ব নেন। এই পুজো কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী একটি দুর্গাপুজো | বর্তমানেও অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে পরিবারটি দুর্গাপুজো পালন করে |

উপরোক্ত বনেদীবাড়ির পুজোগুলি ছাড়াও কলকাতা শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন বনেদীবাড়ির দুর্গাপুজো | সেসব বাড়ির সাথে একদিকে যেমন জড়িয়ে রয়েছে অতীত ঐতিহ্য তেমনিই রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা পুজোর বিভিন্ন রীতিরেওয়াজ | এখনো এই বাড়ির পুজোগুলির মূল আকর্ষণ হলো বিভিন্ন প্রাচীন রীতি ও ধর্মীয় শিষ্টাচার |

এরকম আরও কয়েকটি বিখ্যাত বনেদি বাড়ির পুজো হলো –

১. ভবানীপুরের দে বাড়ির পুজো , এই পুজোয় আজও অসুর এর মূর্তি থাকে ব্রিটিশরূপী |

২. ১৭০ বছরের প্রাচীন পথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের খলৎ ঘোষের বাড়ির পুজো |

৩. জোড়াসাঁকোর নরসিংহ দাঁ বাড়ির পুজো |

৪. ১৫৭ বছর প্রাচীন দেবেন্দ্র মল্লিক রোডের পূর্ণচন্দ্র ধর এর পরিবারের পুজো |

৫ . দেড়শো বছরের প্রাচীন মানিকতলার সাহা বাড়ির পুজো |

৬. ১৮৫৭ সালে শুরু হওয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসাপাতালের কাছের কলুটোলা লেনের

বদনচন্দ্র রায়ের বাড়ির পুজো |

৭ . দুশো বছরের প্রাচীন বাগবাজারের হালদার বাড়ির পুজো |

৮. ১১৬ বছরের ঐতিহ্য সম্বলিত হেদুয়া মোড়ের কাছে দত্ত বাড়ির পুজো , এই পুজোর বিশেষ

বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিমায় শিবের কোলে দেবী দুর্গাকে পূজিত হতে দেখা যায় |

৯. ১৭৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঝামাপুকুর লেনের চন্দ্র পরিবারের পুজো |

১০. ঠাকুরদাস পালিত লেনের রামগোপাল সাহার পরিবারের ১৭৫ বছর প্রাচীন পুজো |

১১. হাটখোলার দত্তবাড়ির পুজো |

১২. আহিরীটোলার ধর বাড়ির পুজো |

১৩. পটলডাঙা স্ট্রিটের বসুমল্লিক বাড়ির প্রাচীন পুজো।

১৪. চোরবাগান এলাকার শীল বাড়ির পুজো |

১৫ . চোরবাগান এলাকার বিখ্যাত ছাতুবাবু – লাটুবাবুর বাড়ির বিখ্যাত দুর্গাপুজো |

বন্দে জননী

দেবরাজ রায়

কলকাতার প্রথম এবং সবচেয়ে পুরনো যে দুর্গোৎসব রয়েছে তার সূত্রপাত এই বড়িশা জনপদ থেকেই। ১৬০৮ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে দক্ষিণবঙ্গের আটখানা জনপদের জায়গীর পান লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় । তারই সাথে পেলেন রায় চৌধুরী উপাধি । সেই থেকে লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের বংশধররা সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার হিসাবে খ্যাত হল । এরপর লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ও তার স্ত্রী ভগবতী দেবী তাদের জায়গীরের সবচেয়ে বড় বড়িশা জনপদে এলেন এবং শুরু হল এই জনপদে দুর্গা পূজা। বড়িশা আটচালা বাড়িতে এই পূজা প্রথম সংগঠিত হয়। কবি বিদ্যাপতি রচিত দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী গ্রন্থানুসারে পুজো হয়ে থাকে। প্রাচীন রীতি অনুসারে দেবীর মুখমন্ডল পানপাতার ন্যায়। টানা ত্রিনয়ন তাঁর। গাত্রবর্ণ অতসী ফুলের মতন অথবা শিউলি ফুলের বোটার রং। গনেশের রং লাল। রাজপুত্র বেশে কার্তিক। চালচিত্র তিন ভাগে বিভক্ত এবং তাতে দশমহাবিদ্যার ছবি আঁকা থাকে । দেবীর সাথে তাঁরা সকলেই পূজিত। মহাদেব এবং শ্রী রামচন্দ্র দেবীর দুপাশে বিরাজিত। আটচালা বাড়িতে কৃষ্ণা নবমী কল্প হয় দেবীর বোধন ; সূচিত হয় সাবর্ণ দুর্গোৎসবের মহা উদ্বোধন। অন্যান্য বাড়িতে হয় ষষ্ঠাদি কল্পে। বোধন পর্বে বিশেষ পুজো পান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও গনেশ। অপদেবতাদের সন্তুষ্ট করতে মহাষ্টমী ও মহানবমীতে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ মাষভক্ত বলি পর্ব। বড় - বাড়িতে হয় অর্ধরাত্রি পুজো। বিরাটী বাড়িতে হয় খুনোপোড়া। পবিত্র সন্ধিপূজা ক্ষণে নিমতা-পাঠানপুর বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয় সাবর্ণ কুলদেবী শ্রী শ্রী মাতা ভূবনেশ্বরী দেবীর বিশেষ পুজো এবং ক্ষীরের পুতুল বলি। অতীতের প্রথা অনুসারে ১৩টি পাঁঠা ও একটি মোষ বলি হত। বর্তমানে সর্বসম্মত ভাবে সব বাড়িতে পশুবলি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে এখন পূজার অঙ্গ হিসেবে আখ ও চালকুমড়ো বলি প্রচলিত। বিরাটীতে ও বড়িশায় বড়-বাড়িতে মহানবমী তিথিতে কুমারী পুজো অনুষ্ঠিত হয়। মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় কালিকিঙ্কর ভবনে সাহিত্য বাসর অনুষ্ঠানে পারিবারিক মুখপত্র সাবর্ণ বার্তা - প্রকাশিত হয়। নবমী সন্ধায় বড়-বাড়িতে এবং দশমী সন্ধায় বিরাটীতে বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। দশমী সন্ধ্যায় গঙ্গাবক্ষে অথবা প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক পুকুরে মা এর বিসর্জন হয়। বর্তমান পুজো প্রাঙ্গন বড়িশায় ছয়টি আটচালা, বড় বাড়ি, মেজো বাড়ি, মাঝের বাড়ি, বেণাকী বাড়ি ও কালিকিঙ্কর ভবন বাকি দুটি বিরাটী রায় চৌধুরী বাড়ি এবং নিমতা-পাঠানপুর বাড়ি। মোট ৮টি ভবনে সারম্বরে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয় । বিজয়া সম্মেলনী পরিবারের মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বড়িশার শ্রীশ্রী রাধাকান্ত মন্দির প্রাঙ্গনে।

KOLKATA'S FIRST TRANSAGENDER PRIEST

TRISHA CHATTERJEE

Since childhood we have seen priests as brahmin male figures. The stereotype was broken when a person broke all the norms and converted from a woman to man to fulfill his dreams. He never knew whether he will be accepted by the society. The patriarchal society has always been supressing and dominating over women, but eventually the norms have changed. Where women are victims of oppression, men with feminine traits and masculine women do not exist in the hierarchy of society.

Kavirag Poddar, a priest was performing Durga puja for the first time where the idol surprisingly itself was " Ardhanarishwar". Kavirag is a metamorphosised male - one who became a male from a female. He is the first transgender priest. Even after the Indian government has recognized the rights of LGBTQ, it was still difficult for people to accept it from their hearts. He still somehow challenged the prevailing religious norms. He worshiped 'shakti' even after belonging from a vaishnava family.

Kavirag mentioned in an interview that when he was in university no one knew him as Ketaki which was his former name. His nickname was Kishai that is Krishna and Rai. It is written in the Bhagavad Gita that Radha was part of Govinda so Krishna and Rai are the same, which symbolize his identity. He even has masters degree in two subjects and has done his research on Durga puja and the rituals during his third masters. He mentioned he got help from his gurukul and from the Brahma Samhita - the only granth of the vaishnavas, containing all the puja archanas. The puja was taking place in the house of another transgender woman, Anuradha Sarkar who was helping him during the aarti to other services.

His first puja was held in the home of Ranjita Sinha back in 2018. He was a member of the Transgender Development Board of West Bengal Government and one of the active organizers of transgenders. Ranjita mentioned that there was a time when the existence of the third gender was socially accepted in the puranas through har-parvati or ardhanarishwara. Those ancient socially accepted the ideas in this puja.

Kavirag said that he used to be very close to his father until he mentioned about his real identity. He was told that all the studying will go in vain as he will not be able to do anything in life with his new identity. He said his father had not spoken to him since then. His mother and relatives supported him silently. He fought through the whole journey to reach where he is now.

Being transgender is extraordinary, strong, persistent and resilient. They have the courage to break free from the box we are put in by the society, religion, family, moments in history and even our own mind.

সৃষ্টি সুখের উল্লাসে

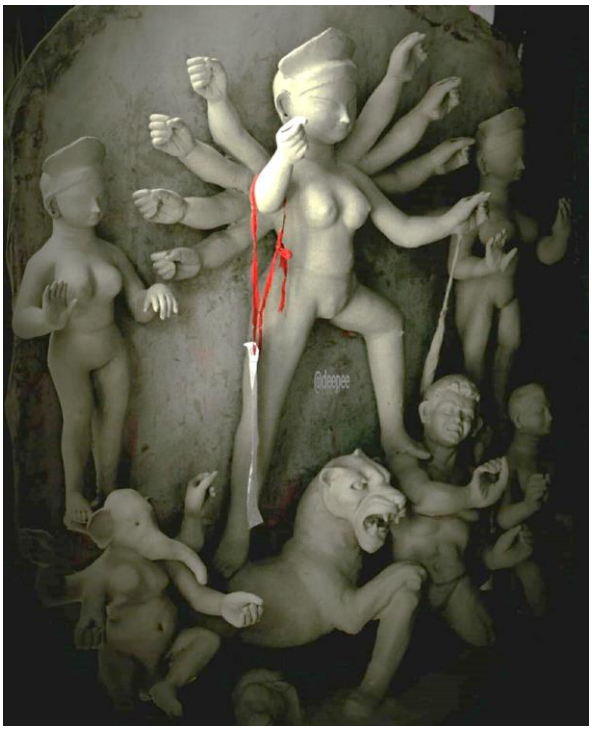

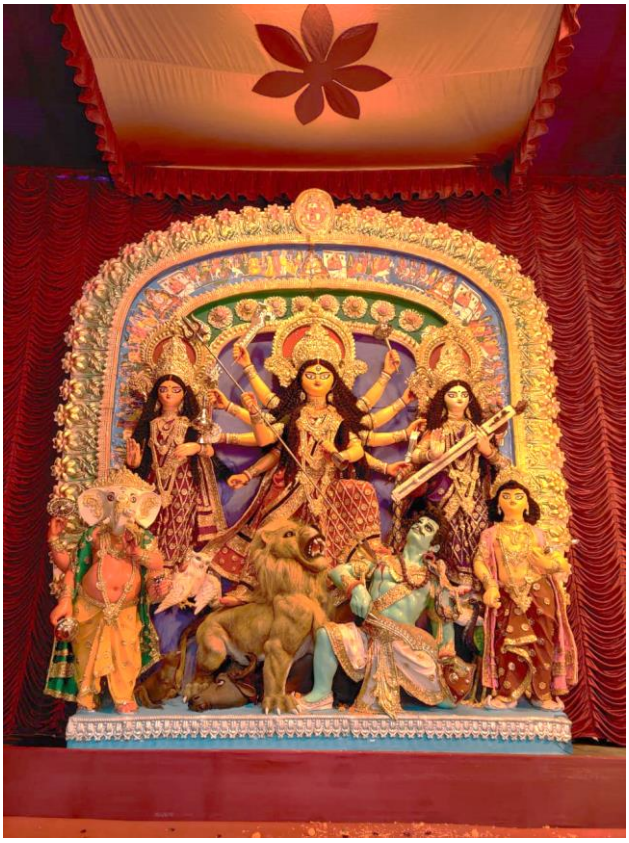

একবিংশ শতাব্দীর দুর্গা

সহজ্যোতি প্রামাণিক

শহর কলকাতা ছাড়িয়ে একটু ভেতরে দক্ষিণের একদম শেষ প্রান্তে আমার বাড়ি। না না! কোন বনেদীয়ানায় মোড়া, ঝাঁ চকচকে আলো আর পারিবারিক গয়না নয়। এখানে শুধু আছে মন, আন্তরিকতা আর মা। আসলে কী বলুন তো,আমাদের মতো ঘরে মা দুর্গার পুজো তো আর যে সে পুজো নয়!তাই আর কি।আর আছে বলতে এক অষ্টধাতুর নথ, যা নাকি কেউ একজন দান করে গেছেন বলে কথিত আছে। আর এই নথ বংশ পরম্পরায় পরে আসছে এ বাড়ির গিন্নি মানে বাড়ির যে পুরুষের নামে পুজো উৎসর্গ তার স্ত্রী, বাড়ির মেয়ের নয়।তবে বাড়ির মেয়ের থেকে বেশি এ বাড়ির খুঁটিনাটি আর কে জানবে বলুন তো দেখি!

সেই ছোট্ট বেলা থেকে দেখে আসছি জানেন, বাড়িতে দূর্গা পুজো। শুনেছি দাদুর কোন এক ঠাকুরদা কোন এক খারাপ কবলে পড়ে গেছিল, সেই সময় তিনি মা কে স্মরণ করেন এবং স্বপ্নাদেশে শুরু হয় আমাদের বাড়ির দূর্গোৎসব।আগে অনেক লোক আসত, অবস্থা জমিদারী না হলেও চলে যেত ধুমধাম করে,মহা সমারোহে।শুনেছি আমার ঠাকুরদার বাবা রাজনাথ প্রামাণিক পুজোয় লাউ বলি দিতেন।সে সময় বড় বড় জমিদারদের পাঁঠা বলি কে তোয়াক্কা না করে লাউ বলি! সত্যি ভাবতে হয়।সাবর্ণ রায়চৌধুরী রা ছিলেন সেই সময়; পুজোও করতেন জাঁকিয়ে। কিন্তু আমাদের ওই ছিঁটেফোঁটাই ভরসা ছিল আর কি!

আমাদের পুজো আসতো বাকিদের মতো করেই, রথের দিনের গঙ্গা মাটি কুমোরটুলিতে দিয়ে মূর্তি গড়া শুরু তারপর "আনন্দমেলা" পত্রিকার আগমন, পরীক্ষা শেষের পর জামাকাপড় কিনতে যাওয়া, পাড়ার পুজোর চাঁদা নিতে আসা থেকে মহালয়ার চন্ডীপাঠ এবং গঙ্গা স্নান সব কিছুই মনে করিয়ে দেয় মা আসছেন।অনেক ছোটবেলা থেকেই মা মহালয়ার দিন আমাকে আর দিদিকে নিয়ে যেত কালিঘাটে, পুজো দিতে। এখনও যাওয়া হয়।

বর্তমানে রাজ-রাজা, জমিদারদের পরে এই পুজো হয় খুব ছোট করে,আনন্দ করে আর এই পুজোর বর্তমান প্রধান উপাসক আমি,হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ গেছে।এ প্রজন্মের সবই কন্যা সন্তান।তাই অগত্যা!আগে ছেলেরাই একমাত্র এই পুজোয় বসতে পারতো। আমাদের বাড়ির এই নিয়ম বছর পাঁচেক আগে পর্যন্তও মেনে এসেছেন আমার অবিবাহিত ফুল পিসি। আমাকে তিনি কোনোদিনই খুব একটা পছন্দ করতেন না। আমিও বেশ কিছুদিন এই পুরুষতান্ত্রিক নিয়মের জন্য বাড়ির বাইরেই থাকি। আজ হাত বদলে এই পুজো আমার নামে সংকল্প করা হয়।

-"পুটু, তাড়াতাড়ি নাম মা, ঠাকুর মশাই ডাকছেন তোকে। শিগগিরই ঠাকুর দালানে আয়।আসার সময় নথটা পরে আসিস।"

-"হ্যাঁ মা, যাই।"

ওই দেখেছেন,ডাক পরে গেছে,আমি যাই।

-"বাঃ, কি সুন্দর লাগছে।পুরো দুগ্গা ঠাকুর।"

- "না কাকিমা, কোন দুর্গা নই।

আমি একবিংশ শতাব্দীর নারী, পুজোর ভারি থালা,অফিসের ল্যাপটপ,শাড়ি আর একটা গোটা কৈলাস সামলাতে জানি।"

কর্তব্য

প্রণীতা পাল

- বাবা, আজ থেকে রোজ আমাকে ৫ টাকা করে বেশি দেবে?

- কেন, রোজ ৫ টাকা করে দি তো তোকে।

- হ্যাঁ, আজ থেকে ১০ টাকা করে দেবে কিনা বলো আগে...তারপর না হয় বলবো আমার আইডিয়াটা।

- আচ্ছা ঠিক আছে তা দেবো না হয়। কিন্তু কি করবি এইবার তো বল।

- পামেলা, তোর্সা আর রোহিনী বলছিল বড়বাজারে যাবে মহালয়ার দিন শাড়ি কিনতে...বড়বাজারে নাকি কম দামে ভালো জিনিস পাওয়া যায়।

- তা তুই নতুন শাড়ি কিনবি...?

- না গো বাবা... ভাবছি পাঁচ প্যাকেট বেলুন কিনে আনবো। আমাদের পঞ্চানন কাকুর দোকানে এক প্যাকেট বেলুন ৫০ টাকা, আর বড়বাজারে ৩০ টাকায় এক প্যাকেট বেলুন হয়ে যাবে মোট ১৫০ টাকা লাগবে। পুজো আর ২২ দিন মতো বাকি ওরা মহালয়ার দিন যাবে তাই আজ থেকে ১০টাকা করে দিতে বলছিলাম। তোমারা ঘুগনি বিক্রি করবে, আর তোমার পাশে বসে আমি বেলুন বিক্রি যে টাকা লাভ হবে ওই টাকায় ঘরে নতুন একটা ফ্রিজটা হয়ে যাবে আশা করি।

- তোকে যত দেখি তত অবাক হয়ে যাই রে মা। একদিন মেয়ে সন্তান হয়েছিল বলে আপসোস করেছিলাম...কিন্তু আজ তুই নিজ গুণে এই পরিবারের দশভূজা হয়ে উঠছিস।

নবগৌরী

চুমকি মাইতি

- কি গো এইবারে তো মেয়েটাকে এখনো কিছু কিনে দিতে পারলাম না। কি করবে কিছু ঠিক করেছ?

- না গিন্নি। ভেবেছিলাম জমির ফসল টুকু বিক্রি করে যা দেনা আছে শোধ দেব। আর মেয়েটাকে একটা জামা কিনে দেবো। কিন্তু বন্যা এসে সব শেষ করে দিল।

- তাহলে এবারেও পুজোতে মেয়েটাকে কিছু কিনে দিতে পারবো না?

- পোড়া কপাল আমাদের। আর কি করবে বলো! একটা মেয়ে তাকে বছরে একবার পুজোতে একটা নতুন জামাও কিনে দিতে পারি না।

- দেখো না কেউ ধার দেয় কিনা!

- এমনিতেই অনেক টাকা ধার আছে। আর কে দেবে আমাদের ধার?

বাবা-মার কথাগুলো আড়াল থেকে শুনছিল মিনি। তার জন্য তার বাবা মা কত কষ্ট পাচ্ছে। সে দৌড়ে গিয়ে তার বাবা মাকে বলল---

"ও বাবা, ও মা এবারে আমার নতুন জামা চাই না।"

- কেন রে মিনি, বাবা কম দামি জামা দেয় বলে?

- না তো। অতুলদাদাদের টিভিতে দেখে এলাম পুজোর সময় নাকি ভীষণ বৃষ্টি হবে। তাই নতুন জামা কিনেই কি করবো? বাইরে তো বেরোতে পারব না।

- একবার তো মণ্ডপে যাবি মা। তখন?

- আহ্ মা, কাদাতে কে নতুন জামা পড়বে। ওই একটা পুরোনো পড়ে চলে যাব এখন। অত ভাবতে হবে না। তুমি বরঞ্চ যেই টাকায় আমায় জামা কিনে দিতে, ওই টাকাটা রেখে দাও। আমাদের বাড়িটা সারানো হবে।

মেয়ের কথা শুনে বাবা-মার আনন্দে দুগাল বেয়ে অশ্রু বয়ে এল। ভাবল সত্যিই তারা ভাগ্য করে একটা মেয়ে পেয়েছে।

সত্যিই আমরা যখন ব্যস্ত আমাদের পাঁচ-দশটা নতুন জামার ঘ্রাণ নিতে, অন্যকোনো মেয়ে হয়তো ব্যস্ত তার বাবা-মার কষ্ট লাঘব করতে।

বোনাস

দিয়া দত্ত

কয়দিন বাকি আর মাত্র পুজোয় শুরু হতে,মহালয়া ঘাড়ের কাছে এসে পড়েছে।অথচ পাখি এখনও বোনাস পায়নি।স্যার যে বলেছিলেন মাসের ১৫তারিখ এর মধ্যেই বোনাস ঢুকে যাবে সবার অ্যাকাউন্টে?আজকেমাসের বাইশ।তাও কোনো খবর এলোনা।বোনাস না পেলে তো সবার জন্য নতুন জামাও কিনতে পারবে না দত্ত বাড়ির ছোট মেয়ে,পাখি।দীর্ঘ দু বছর পর ওরা এবারে পুজোয় নতুন জামা কাপড় পরবে,কোথাও না ঘুরতে যাক ওর মা অষ্টমীর অঞ্জলী দিতে যাবে ওর দেওয়া নতুন শাড়ি পরে, সবাই কে পাড়ার লোকেদের সাথে দেখা হলে শাড়ি ত দেখিয়ে বলবে "এই দেখো,এই শাড়ি টা এবছর পুজোয়পাখি দিয়েছে আমাকে।" পাখির ছোট ভাই টাও বলেছে " দিদি দুবছর তো ঘর থেকে বেরোয়নি পুজোয়, এবছর একটু হাত খরচ দিবি বন্ধুদের সাথে রেস্তরাঁয় যাবো।ওরা আগের বছর গিয়ে কত রকমের খাবার খেয়েছিল,এবছরও যাবে বলেছে,আমিও যাবো তো রে ওদের সাথে?" পাখি নিরুত্তর হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসেছে, মাথায় হাত বুলিয়ে ঘাড় হেলিয়ে দিতেই দেখেছে তার ভাই এর মুখে গ্রীষ্মের সূর্যের মত ঔজ্বল্য ফুটে উঠেছে।সেদিন থেকেই পাখির জেদ মা আর ভাই এর জন্য পুজোয় নতুন জামা কিনে দিতে হবে,আর একজনের জন্যও কিনতে হবে একটা জামা একটা পারফিউম আর একটা গোলাপ।অনেক দিনের সখওর ভালোবাসার মানুষটা কে এইভাবে গুছিয়ে একটা উপহার দেবে।কিন্তু তার স্বপ্ন কে বাস্তব করার মাঝে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই বোনাস টা।

এই সব চিন্তা করতে করতে ফোন করে অভি কে,দুবার বেজে বেজে কেটে গিয়ে তিন বারের বারে বিরক্ত মাখা একটা গলা ফোন তুলে বলে "কি বল"

"না তোমার খবর জানার জন্যইকল করেছিলাম, ব্যস্ত আছো?"

মরে যাইনি রে,একটু ঘুম টা লেগেছিল চোখে,তখনই ফোন করলি,বলেছি না যখন তখন ফোন করে ডিস্টার্ব করবি না,তোর কাজ বাজ নেই বলে কি আমি ফাঁকা ঘুরে বেড়াই নাকি,পরে ফ্রী হয়ে কল করবো রাখছি" কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই ফোন টা কেটে গেলো।পাখি আরকোনোকথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে হাঁটা দেয়,পড়াতে যেতেহবে আবার।

পড়িয়ে বাড়ী ফিরছে এমন সময় ফোন একটা নোটিফিকেশন,চকিতে মুখটাও আলো হয়ে যায় পাখির,পূর্ণিমার চাঁদের স্নিগ্ধ আলো যেমন সারা পৃথিবীর অন্ধকার কে ভাসিয়ে দেয় ঠিক সেই রকম আলোরঢেউ খেলে গেলো পাখির মুখ ভরে।টাকা ঢুকেছে।নগদ সাত হাজার টাকা বোনাস।সে তো ভাবতেই পারছে না।সারাদিনের ক্লান্তি চিন্তা এক নিমেষে শেষ হয়ে যায়,রাস্তা টা পুরো ফাঁকা হলে সে নিশ্চয়ই লাফাতে লাফাতে বাড়ী যেত,কিন্তু যাই হোক বাড়ী ফিরেই সে গিয়ে মা কে জড়িয়ে ধরলো,অনেক ক্ষন চুপ করে জড়িয়ে ধরে বসে থাকলো,মা তিন বাড়ী রান্না করে এসে সবে একটু পাখার তলায় বসেছিল।আচমকা জড়িয়ে ধরতেই খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলো " এই মেয়ে সর ত বাপু ঘেমো গায়ে আমাকে জড়াস না তো আর একটু শান্তি তে বসতে দে।"

তাতেও যখন মেয়ে ছাড়লো না তখন সে চুপ করে পাখির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, " কীরে কি হয়েছে বলতো" পাখি কিছুই বললো না শুধু মাথা নাড়ল।মনে মনে সে তখন ভাবছিল,কাল দুপুরে খাবার টাইমে বেরিয়ে গিয়ে টাকা তুলতে যেতে হবে ব্যাংকে,সন্ধ্যে বেলা একেবারে মায়ের জন্য দুটো শাড়ি r ভাই এর জামা র একটা নতুন jeans কিনে বাড়ী ঢুকবে সে,আর হ্যাঁ নিজের জন্য একটা চটিও কিনতে হবে।ভাবতে ভাবতে ওর মুখটা আবার হাসি তে ভরে যায়

রাত্রে সব কাজ সেরে যখন অভি কে মেসেজ করে,দেখে ও অনলাইন নেই,এত রাতে ফোন করা বরণ তাই আরো কিছুক্ষন অপেক্ষা করে ঘুমিয়ে পড়ে।কাল সকাল টা যে কতক্ষনে হবে শুধু সেই চিন্তাই ওর মাথায় ঘুরছে।

কেনাকাটা সেরে একটা চায়ের দোকানে দাড়ায় পাখি।দুপুরে টাকা তুলতে গেছিলো বলে কিছু আর খওয়ার সুযোগ পায়নি।একটা বাপুজি কেক আর একটা চা চেয়ে নড়বড়ে বেঞ্চিতে বসলো।কেক টা শেষ করতে একটুও সময় লাগলো না ওর।ঢক ঢক করে অনেক টা জল খেয়ে বসলো আবার বেঞ্চিটায়, এবার আরাম করে চায়ে চুমুক দেওয়া যাবে।তখনই বেজে ওঠে ফোন একটা অচেনা নম্বর,ফোনটা ধরতেই উল্টোদিক থেকে একটা গলা বলে ওঠে " পাখি দি বলছো তো?"

"হ্যাঁ, আপনি কে…"

"আমি অমিত গো পাখি দি, অভি দার ভাই, তোমাকে একটা খবর…না মানে তুমি কি একটু ফ্রী আছো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ বলো আমি ফাঁকাই আছি, কি হয়েছে?"

হঠাৎ ফোন এর ওপারের গলা টা হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে, সামলে নিয়ে বলে, "দাদা আর নেই গো পাখিদি।কাল রাতে,ওদের কোন এক বন্ধুর বাড়ি আড্ডা বসেছিল।অনেক নেশা ভান করে মাঝ রাতে বাড়ি ফিরছিল বাইকনিয়ে নেশার ঘরে কি ভাবে চালিয়েছে বুঝতে পারেনি গো দিদি।আজ সকালে বাইক এর নম্বর খুঁজে পুলিশ আমাদের ফোন করেছিল।থানায় গিয়ে দেহ ছড়িয়ে নিয়ে যেতে বলেছে গো পাখি দি।দাদা আর নেই গো" বলতে বলতে আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে অভির ছোট ভাই।

কিছু বুঝতে পারেনা পাখি,তার সাথে কি কোনো রকম মসকরা করছে ওরা বলতে টা কি চাইছে অমিত।আদেও এটা অমিতই তো?এই আড়াই মিনিট যে একনাগাড়ে ফোনের ওপাশের ছেলেটা বলে গেলো এর মানে কি?ও সব কি সত্যি নাকি?না সত্যি তো হতে পারেনা।এখনও তো ওকে শার্ট গিফট করা বাকি,পুজোয় ঘোরা বাকি।দুবছর আগে বাবার চলে যাওয়ার পর এইবার ভেবেছিলো একটু নতুন করে সব কিছু শুরু করবে,প্রিয় মানুষটার সাথে বেরোবে,সব তো এভাবে শুধুই স্বপ্ন হয়ে থেকে যেতে পারে না।না না কিছুতেই না এটা হতে পারেনা।ফোন টা শক্ত করে ধরে হ্যালো বলতে গিয়ে দেখে কলটা কখনই কেটে গেছে।ঘুরিয়ে কল করে পাখি জানতে চায় এই সব কিছুর সত্যতা আরো একবার পুরো ঘটনা টা শোনে মন দিয়ে প্রত্যেক টা কথা ওর বুকের মধ্যে পেরেকের মত বিধে যায় মনে হয় কল ত আরোকিছুক্ষন ধরে থাকলে কান ফেটে রক্ত বেরোতে থাকবে,কিছু না বলেই কেটে দেয় পাখি কলটা।চোখ থেকে কখন যে অঝোরে জল ঝরে বুকের কাছের ওড়নাটা ভিজে গেছে খেয়ালই করেনি।মনে হয়গলা টা কেউ খুব শক্ত হাতে চেপে ধরেছে,বুকের মধ্যে কয়েক কিলোর পাথর চাপা দিয়ে দিয়েছে।কোনো মতে,দোকানের টাকা মিটিয়ে ব্যাগপত্র কাধে তুলে বেরিয়ে যায় দোকান থেকে।আস্তে আস্তে হাটতে থাকে বাড়ির দিকে রাস্তা ঘাটঅচেনা মনে হতে থাকে পাখির,পা দুটো যেনো তার আর জীবনের বোঝা বইতে পারে না।

বাড়ির গলিতে ঢোকার সময় হুশ ফেরে কেলটুর ভৌ ভৌ আওয়াজে,ওর জন্য বিস্কুট আনা হয়নি।কোনো মতে চোখ মুছে যতটা সম্ভব নিজেকে সামলে নিয়ে কেলতুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে sorry রে কাল তোকে দু প্যাকেট এনে দেবো আজ একদম ভুলে গেছি।আদর খেয়ে কেলটু ওর পায়ের কাছে শুয়ে পরে।শূণ্য মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বাড়ি ঢোকে পাখি।আজ সবার পুজোর জামা হয়েছে আজ তো আনন্দের দিন।

লিস্ট

প্রীতম জানা

- জলদি লিস্ট টা দাও বাস যে চলে যাবে।

এই প্রথমবার পুজোর কেনাকাটির জন্য শহরে যাচ্ছেন রতনবাবু। সামনেই দুর্গাপুজো আর একমাস ও বাকি নেই। ছোটবেলা থেকে অভাবের সংসারে বড়ো হয়ে ওঠা রমা- র (রতনবাবু র স্ত্রী) কোনোদিন নতুন কাপড় জোটেনি। তাই এইবার সেই শিকে ছিঁড়বে বলে সে বেশ খুশি।

- হ্যাঁ, সবই তো এনেছি ঠাকুরমশাই, তাও লিস্টটা দেখে বলছি, আপনি একবার মিলিয়ে নিন।

লিস্ট মেলাতে মেলাতে দু এক ফোঁটা জল ভিজিয়ে দিলো পুরোনো অতীতের স্মৃতিগুলোকে, দীর্ঘ জীবনের অভ্যেস গুলোতে একটু ছেদ পড়লো। এই বুঝি শেষ হল রমার জীবনের এক অধ্যায়। রমা এক বুক দীর্ঘশ্বাস নিয়ে উঠে গেল রতণ বাবুর ছবির ফ্রেমের কাছে। টেবিলের উপর পড়ে রইলো লিস্টটা।

চলন্তিকা

Rammohan Roy – the man who led India to modern age

Subir Ghosh

After the death of Aurangzeb in 1707, a state of utter political chaos and social disorder set in all over India. It became impossible to create a congenial environment for fresh and creative thoughts to flourish. For a little over hundred years, the country hovered between two worlds -- one dead, the other powerless to be born. Rammohan Roy arrived at this fateful juncture -- during a period of moral and intellectual decadence in India. As a young scholar, Ram Mohan had witnessed the colonialisation of the subcontinent –transfer of power from the Indian feudal lords to foreign mercantile marauders. These catastrophic events, accompanied by the collapse of the law and order and a dismal socioeconomic scenario, the Dark Age had cast its ominous shadow over India.

Heralding a new dawn

An age is called dark when reason is at a discount, even dangerous. Social decay and loss of ethical values bring about long spells of chaos and disorder. This is a time, when society accepts dogmatic beliefs without questioning or doubt. Ram Mohan Roy grew up in this dark and dismal perspective. He heralded a new dawn as the morning star of the Indian Renaissance -- a prophet of humanism and rationality.

Every Renaissance begins with a cry -- the cry of the human spirit to be free. The renaissance that Ram Mohan ushered in marked a period of transition in values, transformation in social sensibilities and rebirth of cultural creativity. The intellectual attributes of a moribund society came to life again. Ram Mohan had a humanitarian vision, strengthened further by a scientific outlook. Almost for a whole century, it is difficult to trace any other illustrious social or political thinker in our country except him. It was in this context that Nehru welcomed him as the harbinger of the modern age in India.

Synthesis of the East and the West

Ram Mohan attempted to awaken the Indians from the sleep of a century. Like the ancient Roman God Janus – the god of transition and beginnings -- he tried to usher in the age of liberal reformist modernization. He revived the ancient Indian scriptures and texts like the *Veda*s and the *Upanishad*. Simultaneously, he stressed on rationalism and scientific approach with a synthesis of the best of the East and the West.

The Brahmo Samaj which he founded was a progressive movement, brought about by the reaction of Western thought upon native philosophy. He revived interest in the ethical principles of the Vedanta school to counterbalance the Western assault on Indian culture.

Rammohan used to share the view of the ancient Roman dramatist Terence: *I am a human being; nothing human can be alien to me*. Such an outlook envisions the notion that human beings should embrace all knowledge and develop their own potentials as fully as possible. He fervently advocated social and religious reformation, a free press and progressive education when the rest of the country was immersed in complacent and comfortable slumber.

His biographer Sophia Dolson Collet aptly described him as '' a living bridge over which India marches from her unmeasured past to her incalculable future, between ancient caste and modern humanity, immemorial tradition and inevitable enlightenment. ''

Nirod C. Chaudhary suggests Ram Mohan Ray's attire reflects his liberal attitude -- his head was adorned by Hindustani Baniyan cap, his moustache represented a Bengali Brahmin, he was swathed in a chapkan and a shawl indicating his Persian influence, and wearing a shoe like an Englishman.

An ardent nationalist

As an ardent nationalist, Rammohan contributed much to the growth of national consciousness and public opinion in the subcontinent. When the British ruler John Adam imposed restrictions on the Indian press in 1823, Rammohan and his friends protested by submitting a memorial to the Privy Council. The memorial was rejected on the ground that a free press could not exist in a country that did not enjoy political freedom. Again, at the initiative of Rammohan Roy and his friend Dwarkanath Tagore, a signed petition on behalf of the Hindu and Muslim citizens was sent to the British Parliament protesting against certain discriminatory clauses of the Indian Jury Act of 1826. When the Bengal government proposed a more traditional Sanskrit college in 1823, Roy protested that classical Indian literature would not prepare the youth for the demands of modern life. He proposed instead a modern Western curriculum of study.

Rammohan used to share the view of the ancient Roman dramatist Terence: *I am a human being; nothing human can be alien to me*. Such an outlook envisions the notion that human beings should embrace all knowledge and develop their own potentials as fully as possible. He fervently advocated social and religious reformation, a free press and progressive education when the rest of the country was immersed in complacent and comfortable slumber.

In his newspapers, treatises, and books, Roy tirelessly criticized what he saw as the idolatry and superstition of traditional Hinduism. As a social engineer, he opposed the savage custom that forced a widow to immolate herself on the husband's pyre. He organized public opinion and began a relentless campaign against the inhuman practice. Eventually, the British government abolished Sutee in 1829. He also campaigned for equal rights for women, including the right to remarry and the right to hold property.

Foreshadowing Marxist philosophy

Ram Mohan watched with enthusiasm the progress of the reform movement in England and the liberal and nationalist revolutions in Europe. In a letter to James Silk Buckingham on 11 August 1822, he asserted 'enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be successful', foreshadowing Marxian philosophy. His liberal democratic ideas sowed the seeds of a liberal constitution in India after the Independence. Incidentally, he also laid the foundation for prose in the Bengali language and made it strong enough to carry the weight of his philosophical arguments.

Gandhiji's mentor and an ardent patriot *Gopal* Krishna *Gokhale described* Ram Mohan as the 'Father of Modern India'. Yet Ram Mohan's relentless struggle to bring about a synthesis between the East and the West, was often misunderstood in some quarters. Gandhiji objected to Ram Mohan's devotion to Western education and dubbed him a "pygmy". Probably, it escaped his notice that a defining feature of Ram Mohun's movement was an inquiry into the past and an assessment of the strength of Oriental tradition to overcome contemporary problems. Recall how he quoted from Hindu scriptures in his debate with his opponents on the abolition of the burning of the widows. However, Rabindranath Tagore understood "Ram Mohan had the full inheritance of Indian wisdom. He was never a school boy of the West, and earned the dignity to be a friend of the West." Gandhiji later contradicted his own cultural pluralism with the fault he saw in Ram Mohan's efforts.

Strikingmodernity

Today, two hundred and fifty years after his birth, we remain grateful to Ram Mohan's legacy -- the broad scope of his enlighted social vision and the striking modernity of his thought. He groped for a way out in an era of darkness and doom. If in our generation we can see further, it is only standing on the shoulders of giants like him.

As the poet said: There are no paths. Paths are only made by walking. Ram Mohan walked alone. The momentous step that he had taken to lead the country out of darkness toward light of reason is his memorable contribution to the making of a resurgent India.

বাংলা চলচ্চিত্র

রাজ্যেশ্বর সাহা

সালটা ১৮৯৫ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর উপনিবেশিক শাসনে পরাধীন ভারতবর্ষে প্রথম সিনেমা এসে পৌঁছেছিল। প্যারিসের লুমিয়ের ভাইয়ের প্রদর্শনীর পরেই। তারপর ১৮৯৬ সালে ৭ জুলাই মুম্বইয়ে প্রথম সিনেমা দেখানো হয়। লুমিয়ের ভাইরা ছোট ছোট ছবি দেখিয়ে দর্শকদের আবিষ্ট করে ফেলেছিল।

অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বজুড়ে এই শিল্প মাধ্যম দ্রুতগতিতে মানুষকে প্রভাবিত করেছে। ভারতীয় দর্শক বিশেষত কলকাতা কেন্দ্রিক পূর্ব ভারতের মুম্বই, চেন্নাই এ প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আস্বাদ পেলেও তা ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতেই সেই সময় বায়োস্কোপ শব্দটি সকলের কাছে প্রচারিত একটি নাম।

এমন কি বাংলাদেশের ঢাকা শহরেও সে সময় ক্রাউন থিয়েটারে বায়োস্কোপ দেখানো হয়। ক্রমশ তা সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে থিয়েটার গান, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির সমন্বয়ে সংস্কৃতির দিক থেকে সিনেমা একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে উঠে আসে। এই মাধ্যম মানুষকে প্রভাবিত করেছে। উল্লেখ্য, নির্বাক ছবির যুগে চিত্রশিল্পীদের ভূমিকা ও প্রাধান্য পেয়েছে।

ভারতীয় সিনেমার পুরোধা দাদাসাহেব ফালকে, বাবুরাও পেন্টার প্রমুখ ব্যক্তি তৎকালীন রবি বর্মার চিত্র সৌন্দর্যে মুগদা ও প্রভাবিত হয়েছেন তার সাথে সাথে থিয়েটারেও যথেষ্ট প্রভাব ছড়িয়েছে চলচ্চিত্র ভাবনার প্রাথমিক সূত্র হিসেবে বাংলার পেশাদারী নাট্যপ্রযোজনা এবং ম্যাডাম থিয়েটারের হিন্দুস্থানী নাটক গুলি সিনেমার আদি কালকে জড়িয়ে রেখেছে। উল্লেখ্য দাদাসাহেব ফালকে যেমন মারাঠি নাটকের দ্বারা উদ্‌ভূত হয়েছেন তেমনি কলকাতা হীরালাল সেন নানা ধরনের নাট্য দৃশ্যকে ক্যামেরায় ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন।

প্রথমের দিকে টুকরো টুকরো চলমান মন্ত্র নির্ভর দৃশ্যের সাথে আঠান নির্ভর বিদেশী ছবি যেমন পোর্টারের 'গ্রেট ট্রেন রবারি', 'আঙ্কেল টম কেবিন' লাইফ অফ ক্রাইম ইত্যাদি ভারতীয় দর্শকের সামনে হাজির হলো। ফলত ছবি তৈরিতে আখ্যান ধারণার সূত্রপাত।

পৌরাণিক কাহিনী নির্ভরতা নিয়েই প্রথম যাত্রাপথ। এভাবেই একটা সৌখিন নাট্যদলের পক্ষের টনি এবং চিত্র মিলে ওই কালের অভিনেতাদের নিয়ে ব্রিটিশ কোম্পানি বোন এন্ড শেফার্ড এর ধার করা ক্যামেরা নিয়ে তৈরি করেছিলেন পুন্ডরিক নামে ছবি। ফাদার লুমিয়েরের সাহায্যে জনৈক হীরালাল সেন আর এক কলেজ ছাত্র প্রবল আগ্রহে মেতে উঠেছিলেন সিনেমা নিয়ে।

হীরালালের বাবা ছিলেন কলকাতার খ্যাতিমান অ্যাডভোকেট। পুত্রের সিনেমা প্রেমে তিনি কিন্তু বাধা দেননি। একসময় বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি করে ছবি দেখানো শুরু করেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানি তৈরি করেছিলেন। পরে তিনি নিজের ছবি তৈরি করার জন্য ফ্রান্সের প্যাথে কোম্পানির সহায়তায় তিনি সহকারী হিসেবে কাজ করেন।

এই সময় ক্লাসিক থিয়েটার অমর দাঁতের উৎসাহে নাটকের দৃশ্যাবলী ক্যামেরায় তুলে প্রদর্শনী করতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে হীরালাল সেন নিউজ রিল বিজ্ঞাপনের কাজ করেন। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে হীরালাল সেন বেশ কিছু স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি করেছেন। কাহিনীচিত্র তৈরীর আকাঙ্ক্ষা তার অপূর্ণ থেকে যায়।তৎকালীন হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার বিজ্ঞাপন সূত্রে জানা যায় ভারতে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র আলি বাবা ও চল্লিশ চোর নির্মাণ করেছিলেন।

বাংলা সিনেমার শতবর্ষ এবং দর্শক সমাজের অবস্থান। প্রথম বাংলা আখ্যানমূলক চলচ্চিত্র হিসাবে গণ্য করা হয় 'সত্যবাদী রাজা হরিশচন্দ্র'। ছবিটিতে প্রযোজক ছিলেন এনফিস্টোন বায়োস্কোপ কোম্পানি আর পরিচালক ছিলেন রুস্তমজি ধোতিওয়ালা। ছবিটির বিজ্ঞাপন অনুযায়ী প্রথম প্রদর্শনীর তারিখ ২৪ শে মার্চ ১৯১৭। এবং নায়িকার চরিত্রে ছিলেন মিস সাভারিয়া।

হীরালাল সেনের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। কুশলী ক্যামেরাম্যান শুধু নন বাংলা সিনেমার জন্য তিনি যে অবদান রেখে গেছেন বাঙালি এবং ভারতীয় দর্শক তাতে চিরকাল কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয় রাখবে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না একসময় জেএফ ম্যাডাম বাঙালি দর্শকদের কথা ভাবতে গিয়ে বুঝেছিলেন প্রয়োজন বাঙালি পরিচালকের এই সূত্রেই বাঙালি তরুণ জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। ছবি করার পর জ্যোতিশ্চন্দ্রই ভিন্ন পাথরের সন্ধান দিয়েছিলেন। সাহিত্যনির্ভর 'বিষবৃক্ষ' অন্যদিকে ডিকেন্সের গল্প নিয়ে 'জেলের মেয়ে' করলেন। তিনি যোগ দিলেন ম্যাডানের এলফিনস্টোন বায়োস্কোপ কোম্পানিতে। তার পরিচালিত প্রথম ছবি মহাভারত 1920 সালে তৈরি এই প্রথম সিনেমায় বাঙালি পরিচালকের উত্থান পরপর বেশ কয়েকটি। পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে যেমন নল দময়ন্তী, বিষ্ণু অবতার, রত্নাবলী ।

বাংলা সিনেমায় এই প্রথম বিদেশী সাহিত্যিকের পদার্পণ এরপর জয়দেব চন্ডীদাস ইত্যাদি ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' , 'রাজসিংহ', 'রাধারানী' ইত্যাদি ছবি বাংলা সিনেমার সবাক যুগে তিনি একাধিক ছবি তৈরি করেছেন। কিন্তু বাঙালি দর্শক ও বাংলা সিনেমা ইতিহাস একটি বিস্তৃত নাম। যেদিন একটি স্থিরচিত্র গতিচিত্র হয়ে উঠেছিল দর্শক হয়ে উঠেছিল বিস্ময়াবিষ্ট। তারা অবাক হয়ে দেখলেন একটি ট্রেন স্থির নয়, নড়েচড়ে এগিয়ে চলেছে। প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে নিঃশব্দ তার চলন গতি। কিন্তু কি করে সম্ভব এই প্রশ্নই দর্শককে সেদিন একই প্রশ্নই দর্শকদের বিস্মিত করেছে বারবার। একি তবে কোন জাদু না ম্যাজিক?আরও পরের ম্যাজিক লণ্ঠন। মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখা এই সব চলমান দৃশ্য সেদিন দর্শককে মায়াময়তায় আবিষ্ট করে রেখেছিল।

ছন্দে ছন্দে

মা আসছে

বিশ্বরূপ দাঁ

মা আসছে বছর ঘুর
সঙ্গে বাহন সিংহ ,
অসুর তোমার বৃথাই চেষ্টা
ভাঙবে তোমার দম্ভ।
ডানদিকে তে লক্ষ্মীদিদি
প্যাঁচার উপর চড়ে ,
ইঁদুর সাথে গণেশ দাদা
দাঁড়িয়ে চুপটি করে।
সর দিদি হাঁসে চড়ে
করছে গানের চর্চা,
কাতু দাদার বিয়ে হবে
সামনে অনেক খরচা।
ঘটনা নয় যে রটনা এ সব
কান দিওনা মোটে,
শুনলে পরে কাতু দাদা
বেজায় যাবে চটে।
সিংহ ভীষণ হুঙ্কার দেয়
মোষ বললো বাঁচা,
অসুর শুধুই খাচ্ছে মায়ের
ত্রিশূলেরই খোঁচা।
মা দুগ্গার রূপটি এবার
হলো পরিপূর্ণ,
মর্তে মায়ের আগমনে
আমরা হলেম ধন্য ।।

আগমনী

অর্ণব মুখোপাধ্যায়

পুষ্প কানন খালি তোমায় ছাড়া,

পাহারায় বসে আছে একাকী রাতের আভা।

যামিনী বলে কিসব কবিতা,

মানে আমি তৎক্ষণাৎ খুঁজি তার ।।

রাতের আঁধারের মধ্যে যখন

জোছনার আলো আসে,

কোন সে নূপুর দূরে বাজলো

কারা যেনো হাসে ।।

শুনি সেই মোর মন হয় বিচলিত,

ছুটে চলি সেই আওয়াজের দিকে আমি শীঘ্র।

রাতের গণ্ডি পেরিয়ে,

সকাল তখন হাসে

শঙ্খধ্বনির সাথে মা মহালয়া হয়ে আসেন ।

পুজোর হাওয়া

চুমকি

শিউলি ফুলের গন্ধমাখা
রঙিন চারিদিক।
পুজোর হাওয়ায় সজ্জিত সব,
মুগ্ধ দিগ্বিদিক।
তপ্ত যখন বালুরাশি
প্রখর রৌদ্র তাপে,
আবেশ ছড়ায় পাগল হাওয়া
আনন্দ উল্লাসে।
আকাশ জুড়ে পেঁজা তুলো
খেলছে অবিরত,
শরৎের এই সৌন্দর্য
দুঃখ-কে করে নত।
পরিপাট্যে মুখরিত সব,
উচ্ছ্বসিত মন,
পুজোর হাওয়া বয়ে আনে হেথা
জীর্ণ মনে নবযৌবন।

আগমনী সভা

বিশ্বরূপ

মা বললেন ত্রিশূলেতে ধার দিয়েছি কবে,
মর্ত ছেড়ে কৈলাসে আর মন যেন না ধরে।
কাতু বললে,চলত মা আগেভাগে ওলা করব বুক,
চড়লে পরে বুঝবে তুমি তার তুলনায় নেইকো সুখ।
সর বললে,ছাড়ত মা কাতুর কথা পড়াশোনা তো নেই,
এত ফাঁকি দিলে পরে হারিয়ে ফেলব খেই।
লক্ষ্মী বললে,কাতুই বরং ঠিক কথা বলেছে,
মামারবাড়ির অনেক মজা,অনেক স্নেহ রয়েছে।
গণা বললে আগে থেকে গিয়ে আমরা কত কিছুই খাবো,
ব্যবসা-ট্যবসা সামলে কিন্তু তবেই আমি যাবো।
শিব বললে,আগে থেকে হঠাৎ এমন যাওয়া যায় নাকি,
পুজো-প্যান্ডেলে এখনো তো প্রস্তুতিই বাকি।
তাছাড়া সবাই যদি চলেই যাও আগে,
ফাঁকা ঘরে আমারও তো মন খারাপ লাগে।
তোমরা বরং ষষ্ঠীতেই পুজোমন্ডপে যেও,
ওইকটাদিন ওইখানেতে যা খুশি তাই খেও।
অবশেষে সবাই মিলে রাখল শিবের মন,
ষষ্ঠীতেই তাই মায়ের মর্তে আগমন।।

প্রকৃতি কথা

অয়ন

আমি মানুষ চিনি অস্ত্র দেখে
আজও শীত করলে বিষাদ টানি ,
রোজ সকালে খবর পাঠায়
মানব - বিহীন এই রাজধানী |
বৃষ্টিমুখর স্বপ্নগুলো
রাত রাত পোহালেই মন্দ রটায় ,
চোখের পাতা খোলা 'ই রেখো
তবু , আকাশ জুড়ে মিছিল ঘটায় |
ব্যাস্ত মিছিল , হাতের রেখা
বৃথায় করে আন্দোলন
নাহয় ,আমার নামে ফতোয়া ছাড়ো
রাজধানী ও বৃন্দাবন |
শান্তি - বিষাদ সাহিত্যতে
রোজনামচায় লজ্জা - ক্ষত,
চোখের ভেতর আগুন মাখো
প্রেম - বিরহ আমারও মজ্জাগত |
আজও, নিম্নচাপে হন্যেহয়ে বৃষ্টি খুঁজি
প্রকৃতি কেবল সাহিত্যতেই ?
অথবা , বদলেয়ারের কাব্যে বুঝি !

সংবিধান

সোনামুনি কুন্তি

সংবিধান একবার হও সংশোধিত,
বিচার যখন সংজ্ঞাহীন,চিতা প্রজ্বলিত।।

হারিয়েছো ক্ষমতা,হারিয়েছো মান,
তুমি কি আবার দেবে ন্যায়ের বিধান।।

নিয়তি ভেবে সবাই নিয়েছিলাম মেনে,
আজ জলে শুধু মোমবাতি,সব কিছু জেনে।।

সব দেশের শান্তি যখন ধর্ষকদের প্রাণ,
তোমার ধারাতে কেন নেই ধর্ষিতার স্থান।।

অপরাধ নয়, পরিচয় বড় হিন্দু কি মুসলিম,
জীবন্ত বলি হচ্ছে কেবল দলিত কিংবা দীন।।

পোড়া শরীর, কাটা জিভ নয় কি প্রমাণ যথেষ্ট,
আদালতে হচ্ছে বিচার কোন ধর্ষক শ্রেষ্ঠ।।

উঠছে আওয়াজ হাঁটছে মিছিল, সবই -
কোথাও ক্ষীণ,
ঘরবন্দী পরিবার, পুলিশের হাতে শেষ চিহ্নও
হচ্ছে মলিন।

সম্পাদক :

ডঃ তপন কুমার পোদ্দার, (অধ্যক্ষ, বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর)

সম্পাদক মণ্ডলী :

শ্রেয়সী ধর

দীপাঞ্জনা বসু মজুমদার

সুমনা সাহা দাস

আকাশ শাউ

শিবশঙ্কর দত্ত

রাজ্যেশ্বর সাহা

কার্যনির্বাহী সাম্পাদক মণ্ডলী

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের সকল ছাত্রছাত্রী

প্রযোজনা:

সাংবাদিকতা ও গনজ্ঞাপন বিভাগ, বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর